SUBJECT- Education

SEMESTER- II

PAPER- EDCA COR O3 T

TOPIC- International Understanding

ধরন অনুসারে গণতন্ত্রে বিভিন্ন রকমের বিদ্যালয় দেখা যায়—যা অনেকটাই স্থানীয় চাহিদাকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠে এবং অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় এদের কোনো কঠোর নিয়মে বাঁধা হয় না। শিশুদের মধ্যে সংঘবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব, দায়িত্ববোধ, সদর্থক শৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের শৈলী প্রভৃতি শিক্ষা দান করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে, একটি আদর্শ গণতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার বিরাট দায়বদ্ধতা আছে। একটি উক্তিকে তুলে ধরলে বক্তব্যটি খুব স্পষ্ট হয়, "Citizenship in a democracy is a very enacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained." তাই একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক সামাজিকভাবে সচেতন হবে। বাস্তবিকভাবে সুদক্ষ, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবাপন্ন, শান্তিপ্রিয়, রাষ্ট্রীয় আইন-অনুগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদার মনোভাবাপন্ন হবে। সে একটি সুখী পরিবারের সদস্য হবে। এবং তার অবশ্যই কিছু পৌর ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ থাকবে। আদর্শ গণতন্ত্রের নাগরিক ঐক্যবদ্ধভাবে বিকাশ, অভিযোজনযোগ্য, সামাজিক, উন্নয়নকামী হবে। আর শিক্ষা এই বিষয়ে নাগরিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবে। তাই শিক্ষার গণতান্ত্রিক দর্শন ব্যক্তিকে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশে এবং ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়তা করে এবং এভাবে সমাজে তাকে একটি আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হয়, তাকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী করে তোলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে তার অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সচেতন করা যায়, নিম্নোক্ত উপায়ে—

(1) বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমাজ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে।

(2) গণতান্ত্রিক শিক্ষা শিশুর মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক শিক্ষায় সকল শিশুকে সমানভাবে শিক্ষাদান করা হয়। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক আদর্শের সহমর্মিতা বোধ প্রভৃতির বিকাশ ঘটে।

(3) প্রতিটি নাগরিক সামাজিক জীব। তাই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রত্যেকের আছে। সেই কারণে শিক্ষাই পারে ব্যক্তির মধ্যে সমাজের প্রতি যথার্থ চেতনার বিকাশ ঘটাতে।

(4) আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক প্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কাছে যেমন একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলে তেমনি শিক্ষার্থী এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রে প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় বিভিন্ন পদ, তাদের কর্মপ্রক্রিয়া, সরকার

ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভোটাধিকার ও তার প্রয়োজনীয়তা, নির্বাচন ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে।

(5) গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী পাঠক্রম ছাড়াও পাঠক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষার্থী এনসিসি, স্কাউট, বিভিন্ন খেলাধুলা, ক্যাম্প, ছাত্র স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠী জীবনে বসবাসের উপযোগী গুণাবলি অর্জন করতে শেখে। বিদ্যালয়ে এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে মমত্ববোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। পরবর্তী কালে তারা সহজেই কোনো বড়ো সামাজিক পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারে।

(6) গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিশুদের মধ্যে নেতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটে। কারণ গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। আর সেই কারণেই আজকের শিশুটি কালকের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব বোধের বিকাশের জন্য তাদের উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজের প্রতি আগ্রহ এই সমস্ত কিছুর বিকাশ ঘটায় শিক্ষাব্যবস্থা।

(7) বর্তমান সমাজব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্ত সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে নিরন্তর আলোচনা করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন, সেহেতু তার প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তিকে অবগত হতে হবে এবং সেইসব উদ্ভূত সমস্যাসমাধানের প্রয়োজনে সক্রিয় ভূমিকাও নিতে হবে। একমাত্র শিক্ষাই পারে এ বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য করতে।

■ আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষা (Education for International understanding) ঃ

বর্তমান যুগকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তির যুগ। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। যা হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধারণার ফল। নিজের জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং অন্যান্য জাতিকে হীন নজরে দেখার এক ঘৃণ্য মানসিকতা। নিজের রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, কিন্তু অন্য রাষ্ট্রকে ঘৃণা করাও জঘন্যতম একটি বিশ্বজনীন অপরাধ। তাই ***Bertrand Russel*** বলেছেন, "Patriotism in its common form is the worst vice from which the modern world suffers"। সেই কারণেই এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ উচ্চ পর্যায়ের মানবিক সম্পর্ক, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগী মনোভাব ইত্যাদির পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, ভয়াবহতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

দেশে দেশে সংকীর্ণতার ঘৃণ্য অনুভূতি দমনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোনো দেশই অন্যদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। একটি দেশ অন্য প্রতিটি দেশকেই সহমর্মিতার চোখে দেখবে। UNESCO-র প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ***Dr. Walter H.C. Lewis*** 1956 খ্রিস্টাব্দে **American Association of Teacher Education**-এ মন্তব্য রেখেছেন, "International understanding is the ability to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere to teach each other irrespective of nationality or culture to which they may belong. To do this one must be able to detach oneself from one's own particular cultural and national prejudices—and to observe men of all nationalities cultures and races on equally important varieties of human beings inhabiting this earth."

আবার অনেকেই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়। এছাড়া বিভিন্ন দেশের উদ্ভূত অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এবং সমস্যাগুলিকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা। সমাজবিজ্ঞানীরা একেই সহমর্মিতা বলে থাকেন। তাঁদের মতে, প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই হওয়া প্রয়োজন যেখানে একটি শিশু বিশ্বনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে ***Dr. Radhakrishnan*** বলেছেন, "If human race is to survive, we have to subordinate national pride to international feeling." সেই কারণে প্রত্যেকটি মানুষকেই মানবিকতায় বিশ্বাস রাখতে হবে। এবং সেই সঙ্গে **'Live and Let Live'** এই মূলনীতিটি অনুসরণ করতে হবে। কোনো দেশই নিজেকে অন্যদেশের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা দেশের ক্ষেত্রে বিভেদ রচনা করা যাবে না। অন্যদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যেককে সঠিক এবং স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। শ্রদ্ধাপূর্ণ মানসিকতা পোষণ করতে হবে।

UNESCO আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যটির বিস্তার ঘটানোর জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলি অনুসরণের কথা বলেছেন—

(১) এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিস্তার ঘটানো হবে।

(২) এই সংস্থাটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, শিল্পী প্রমুখ মানুষের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান ঘটাতে সাহায্য করবে এবং নিজস্ব সৃজনাত্মক নব নব পরিকল্পনার দ্বারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

(৩) বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ভীতি, যুদ্ধের আশঙ্কা, দুর্বল মনোভাব প্রভৃতি হ্রাস করতে হবে।

(৪) পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল দেশগুলিকে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে।

(৫) বিভিন্ন দেশে শিক্ষার জন্য বিষয়বস্তুর সংস্কার করবে এবং আন্তর্জাতিক মানের পুস্তক রচনার উপর গুরুত্ব দেবে। কিন্তু কীভাবে দরিদ্র দেশগুলিতে সাহায্যের মাধ্যমে নিরক্ষরতার অপসারণ ঘটাবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

(৬) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য UNESCO অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠানো ব্যবস্থা করেছে যাতে বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারা ও মতামত তাঁরা আদানপ্রদান করতে পারেন।

(৭) প্রতিষ্ঠানটি উচ্চশিক্ষার জন্য গবেষণামূলক কাজকে সাহায্য করবে।

● আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা (Need for International Understanding) ঃ

বর্তমান কালে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষে মানুষে মনের সংযোগ গাঢ়তর হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের যাবতীয় ঘটনা আজ সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয়। সেই কারণেই মানুষের জীবনকে আরও সহজ, আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন, আর তার জন্যই প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া।

বর্তমানে আমাদের জীবনধারণের প্রকৃতি অনেকটাই বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে যেখানে বিশ্বজোড়া গ্রামের কথা বলা হচ্ছে সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে যেখানে খুশি সহাবস্থান করবে এবং বিশ্বের প্রতিটি সম্পদে তারও অধিকার আছে—এই নিশ্চিত চিন্তাধারা রেখে স্বচ্ছন্দে সে জীবনধারণ করতে পারবে এবং যাবতীয় সুযোগ ভোগ করতে পারবে। এর জন্যও দরকার আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া।

এক জাতি এক রাষ্ট্রের ধারণা বর্তমানে—বিশ্বজনীন ধারণায় পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ বর্তমানে সকলের মধ্যে সমতার ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সকলের যে সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সমাজে সুযোগসুবিধার প্রয়োজন আছে, সেখানে এই সত্য সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই প্রতিটি দেশের মধ্যে সহাবস্থান ও বোঝাপড়া প্রয়োজন।

শোনা যায়, বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করত। সেই সময় আন্তর্জাতিক সহাবস্থান যেভাবে বজায় ছিল তা অনুসরণ করে বর্তমানের বিষয়টিকে নতুনভাবে ভাবা যায় এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ভিতটিকে আরও মজবুত করা যায়।

বর্তমানের যে ভয়াবহ পারমাণবিক যুগে মানুষ বসবাস করছে তাতে মানুষের মানবিক দিকটির প্রতি বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা চলছে তা বন্ধ করার জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

● **আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ (Obstructions in the way of International Understanding) ঃ**

ভৌগোলিক দূরত্ব—পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে। ফলে মানসিকাতর মধ্যে ব্যবধান ঘটানো সহজ হচ্ছে না।

রাজনৈতিক দূরত্ব—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বোঝাপড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অর্থনৈতিক বাধাসমূহ—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন রকমের নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক অর্থবিনিময়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ধর্মীয় বাধাসমূহ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী মানুষের বসবাস। আর বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের মধ্যে আবার পৃথক পৃথক ধর্মীয় আচার-আচরণ বর্তমান।

ভাষাগত বাধা—অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে। ভাষা পার্থক্য ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়।

মনোবৈজ্ঞানিক বাধাসমূহ—বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক বৈপরীত্যের মধ্যে শিশু বড়ো হলে তার মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষোভ, হতাশা, হিংসা, বিদ্বেষ এসবের মধ্যে শিশু বড়ো হলে তাদের মনে বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা, আগ্রাসন ও যুদ্ধবাজ মনোভাব জেগে ওঠে।

শিক্ষাগত বাধাসমূহ—কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেকসময় বিভিন্ন রকম সামাজিক বিজ্ঞানগুলি এমনভাবে পড়ানো হয় যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাত্যভিমান, জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি জাগ্রত হয়।

1994 খ্রিস্টাব্দে জেনিভাতে শিক্ষার 44 তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষার বিভিন্ন দিক। বিভিন্ন রকম সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কীভাবে শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে সফল করে তোলা যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য যে সমস্যাসমূহ বর্তমান সেগুলিকেও দূর করা প্রয়োজন। শান্তির প্রবক্তাগণ সকলেই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য পাঠক্রম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সগুলিতেও বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। UNESCO আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছে। তা ছাড়া 1948 খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব প্রদান করে।

● **শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education) ঃ**

আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসারের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। এবং সেগুলি হবে নিম্নরূপ—

(a) শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

আন্তর্জাতিক অনুভূতি বিকাশের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(i) স্বাধীনভাবে চিন্তার বিকাশ—প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার স্বাধীন বুদ্ধি, চেতনাবোধ, যুক্তিশক্তি ও বাস্তবিকতার দ্বারা সমস্ত বিষয় বিচার করতে হবে। নিজের দেশ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব তার থাকবে না।

(ii) বিশ্ব নাগরিকতা মনোভাবের বিকাশ—শিক্ষা শিশুর মধ্যে এই ধারণাই গড়ে তুলবে যে, সে হল বিশ্বরাষ্ট্রের এক সুযোগ্য নাগরিক।

(iii) নিজের জাতি বা রাষ্ট্র সম্পর্কে জাত্যভিমান এবং অন্য জাতির প্রতি হীনম্মন্যতা বোধ নির্মুল করাই হল শিক্ষার অন্যতম কর্তব্য। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধার্থে সমস্ত দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আধুনিক এই প্রগতির যুগে কোনো দেশের পক্ষেই এককভাবে এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক বজায় না রেখে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। সেই কারণেই বর্তমানে মানসিকভাবে এবং প্রাক্ষোভিক দিক থেকে সমগ্র বিশ্ব সমাজের নাগরিকদের প্রস্তুত করাতে হবে এবং তাদের মধ্যে অপরিমিত দায়বদ্ধতার সুদৃঢ় মানসিকতা তৈরি করতে হবে, যার অন্যতম মাধ্যম হবে শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্যও প্রস্তুত হবে সেই দিশা অনুসারে।

(iv) মানুষ এখন পারমাণবিক যুগে বাস করছে। সেই কারণে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগরণের প্রয়োজন। পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধে এই সচেতনতার বিকাশ ঘটাবে শিক্ষার লক্ষ্যের উপযুক্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাছাড়া, শিক্ষার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গেও মানুষ সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে।

(v) এর সঙ্গে প্রয়োজন হল মানবিকতার জাগরণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করতেন। মানবিকতার ধর্মই তাঁর নিকট মহান ধর্ম—যা দেশ, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে।

সকল মহৎ ধর্মই মানবসমাজের সাম্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। মানবজীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এবং এই বিষয়টিকে সঠিকভাবে বোঝার মধ্যে দিয়েই মানবিকতার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করা যায়।

(b) পাঠক্রমের সংস্করণ ঃ

আন্তর্জাতিক চেতনার সম্প্রসারণের জন্য পাঠক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন।

(i) বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কলার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটাতে হবে।

(ii) বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মানবিকতার নিরিখে যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সাধিত হয় সেগুলি সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করতে হবে।

(iii) বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে অন্ধবিশ্বাসগুলি বিনষ্ট করতে হবে।

(iv) বিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়টি নিয়ে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিশুর মধ্যে পৃথিবীর শত শত দেশের মধ্যেই একত্ব সম্পর্কে নিবিড় আত্মীয়তামূলক ধারণা গড়ে ওঠে।

(v) যাঁরা বিশ্বের ইতিহাসে সামাজিক অবদান রেখেছেন ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান যথাযথ তুলে ধরতে হবে।

(vi) পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবল নাগরিকতাবোধের বিকাশ না ঘটিয়ে তারা যে একটি সমগ্র বিশ্বসমাজের সভ্য এবং এই বিশ্বসমাজের প্রতি তাদের একটি মহান কর্তব্য আছে সেটিও তুলে ধরতে হবে।

(vii) কেবল পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষণের উপর জোর না দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপরও জোর দিতে হবে।

(viii) বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পত্রমিতালি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

(c) শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঃ

আন্তর্জাতিক সচেতনতা বোধ জাগরণের জন্য পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। এগুলি হল—

(i) শিক্ষণ পদ্ধতি চলাকালীন সময়ে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকতা বোধের বিকাশ ঘটে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ii) বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে তা প্রশমিত করার জন্য ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলি পাঠদানকালে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যাতে অন্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি এবং জাতীয়তার প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ তৈরি হয় তার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

(iii) যে শিক্ষক শিক্ষণ দান করবেন তিনি তাঁর নিজস্ব আদর্শ, চিন্তাভাবনা ও যুক্তিশক্তিকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান করবেন।

এই বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন যেসব আনুষ্ঠানিক কোর্স শুরু করেছে সেইগুলির মাধ্যমেও যাতে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটানো যায় সেদিকে লক্ষ দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের সমস্ত দিকগুলিকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য পেশার ব্যক্তিদের প্রয়োজনে অন্যান্য দেশে পাঠাতে হবে অর্থাৎ মানবসম্পদ বিনিময় করতে হবে। আর সেই কারণেই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তার মধ্যে দিয়ে সহজেই আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ সম্ভবপর হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

(d) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি ঃ

পাঠক্রমিক কার্যাবলি ছাড়াও শিশুদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যেমন—

- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দিবস, শিশু দিবস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দিবসগুলি পালন করা।
- খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পাঠ করা।
- বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পত্রমিতালি স্থাপন করার জন্য শিশুদের উৎসাহ দেওয়া।
- শিশুদের টিভি ও রেডিয়োর বিভিন্ন খবরাখবর শুনতে উৎসাহ দান করা।
- সমস্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং যৌক্তিক বাধা এড়িয়ে সারা পৃথিবীর মহান মানুষদের জন্মোৎসব পালন করা।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যামূলক বিষয় আছে সেগুলি নিয়ে বিতর্ক সভা আয়োজন করা।
- বিভিন্ন দেশের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারণের উপর প্রদর্শনী আয়োজন করা।
- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- বিদেশ থেকে ঘুরে আসা মানুষদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা।

(e) শিক্ষকদের ভূমিকা ঃ

আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন—

- একজন ভাষাশিক্ষক কেবল ভাষা শিক্ষাদানের মধ্যেই নিজের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ভাষাগুলির মাধুর্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি যথাযথ শিক্ষা দেবেন। তিনি ভাষার বহুমাত্রিকতাকেও গুরুত্ব দেবেন।
- শিক্ষক যখন ইতিহাস শিক্ষা দান করবেন তখন বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষরা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেসব অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যথাযথ ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- পৌরবিজ্ঞান শিক্ষণের সময় শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নাগরিকদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার চেতনাও জাগিয়ে তুলবেন। আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা দেবেন।
- ভূগোল শিক্ষা দানের সময় দেশের বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে হবে। আবার ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যবাহী একক অস্তিত্ব সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে।

এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেবেন। যেমন—

- আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ এবং মতাদর্শ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটানো।
- আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশের প্রতি সহায়ক মনোভাবের প্রসার ঘটানো।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে সংকীর্ণ মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত চেতনার বিকাশ ঘটানো।
- বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা।
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে যুক্তিশক্তির প্রয়োগ তারা করতে পারে এবং তারা যাতে সঠিকভাবে সেই সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে পারে অথবা সেগুলি সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে পারে তার জন্যও তাকে উদ্‌বুদ্ধ করা।

■ মানবিক মূল্যবোধ (Human Values) ঃ

সাধারণত ভাষাগত দিক দিয়ে মূল্য কথাটির অর্থ হল, যে বিষয়ের কোনো দাম আছে অর্থাৎ যা মূল্যবান। অন্য অর্থে মূল্য বলতে বোঝায় আচরণের কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি। *জন ডিউইকে* অনুসরণ করে বলা যায় যে, মূল্য প্রাথমিকভাবে একটি পুরস্কার,

যা পরিমাপ করা যায়, আবার যা পরিমাপক। এর অর্থ হল কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করা। তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একটি বস্তুর প্রকৃতিকে বিচার করা।

মানুষ একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাস করে। সেখানে মূল্যবোধকে মানবজীবনের উচ্চতর স্থানে রাখা হয় এবং উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই কারণেই মানবজীবনে মূল্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—যা ব্যক্তির চরিত্রকে উপযুক্ত অর্থ এবং সামর্থ্য প্রদান করে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারক্ষমতা, সিদ্ধান্ত এবং পছন্দ, আচরণ সম্পর্ক, স্বপ্ন এবং লক্ষ্য সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করে। মূল্যবোধ আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। মূল্যবোধ মানুষের সঠিক দিশায় চলতে সহায়তা করে।

মূল্যবোধ হল জীবনের নির্দেশনাদানকারী নীতি যা ব্যক্তির সঠিক বিকাশে সহায়তা করে। মূল্যবোধ একটি ট্রেনের মতো—যা একটি নির্দিষ্ট পথে ব্যক্তির গতিকে নির্দেশ করে, যাতে ব্যক্তি তার জীবনের পথে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলতে পারে। মূল্যবোধ ব্যক্তির জীবনের গুণগত মানকে উন্নত করে।

বর্তমান কালে মূল্যবোধ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মূল্যবোধ নিয়ে তারা সকল সময়ই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। এর অন্যতম কারণ হল আমাদের দেশে নাটকীয়ভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ সুপ্রাচীন মূল্যবোধগুলির কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। তা ছাড়া বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে অনুকরণযোগ্য আদর্শ প্রতিরূপের যথেষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দাম্ভিকতা এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দ্বৈত উপস্থিতি ইত্যাদি। তা ছাড়া বর্তমান মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন ধারণা জন্ম নিয়েছে। দরিদ্র, আর্ত, অসুস্থ, বৃদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক অক্ষমদের জন্য মানুষের এখন নতুন সচেতনতার অভাব ঘটেছে। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ছে এবং প্রকৃত মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো ধারণাও থাকছে না।

অনেক সময় নতুন প্রজন্ম পুরোনো মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছে। অনেক মানুষই আবার পুরাতন মূল্যবোধগুলির উপযুক্ত মূল্যবোধের সন্ধান পায়নি। ফলে তাদের জীবন অনেকটাই বদ্ধ জলাশয়ের মতো আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই অবস্থা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয়। মূল্যবোধ ছাড়া জীবনের সঠিক দিশা থাকবে না এবং ব্যক্তির সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হয়। সঠিক মূল্যবোধ ছাড়া জীবন অনেকটাই ছন্নছাড়া বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাই জীবনকে সঠিক ছন্দে পরিচালিত করার জন্য মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রয়োজন।